বহু বৎসর ধরিয়া ভারতের কৃষিক্ষেত্রটি অবহেলিত হইয়াছে, ফলে কৃষি ক্রমশ অলাভজনক হইয়াছে।কেন্দ্রের বাজেট দেখিয়া ক্ষুব্ধ কৃষকরা অভিযোগ করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে প্রতিহিংসা। প্রকৃত চিত্রটি আরও উদ্বেগজনক। এই বৎসর কৃষির বরাদ্দ যে চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে, তাহা এক প্রকার হতাশার অভিব্যক্তি। ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের কৃষকদের আয় পাঁচ বৎসরে দ্বিগুণ করিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইবার আশা সামান্য, তাহা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই বাজেটে নূতন লক্ষ্য স্থাপন করিবার পরিবর্তে সরকার যেন কৃষি হইতে মুখ ফিরাইল। কৃষিক্ষেত্রে সামগ্রিক বরাদ্দ কার্যত বাড়ে নাই, বরং সামগ্রিক বাজেটে কৃষির ভাগ কমিয়াছে— গত বৎসর যাহা ৪.৩ শতাংশ ছিল, তাহা হইয়াছে ৩.৮ শতাংশ। কৃষকের ক্ষতির ঝুঁকি কমাইতে এবং কৃষি বিপণনে গতি আনিতে বেশ কয়েকটি প্রকল্প গত কয়েক বৎসরে ঘোষিত হইয়াছিল। সেইগুলিতেও যে বরাদ্দ কমিয়াছে, তাহা ভাল লক্ষণ নহে। যেমন প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় বরাদ্দ কমিয়াছে। ইহা হয়তো অপ্রত্যাশিত নহে— গুজরাত, পশ্চিমবঙ্গ-সহ বেশ কিছু রাজ্য ওই প্রকল্প হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে; কৃষিঋণ হইতে বিমা বিযুক্ত হইবার পরে চাষিরাও বিমায় আগ্রহী হয় নাই। কিন্তু এই সঙ্কোচন সমগ্র প্রকল্পটির কার্যক্ষমতা বিঘ্নিত করিতে পারে। স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণে সরকারি ভর্তুকির জন্য বরাদ্দও যৎসামান্য বাড়িয়াছে। প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধিতে বরাদ্দ গত বৎসরের তুলনায় বাড়িয়াছে অতি অল্প, অতএব অনুদানের দ্রুত সম্প্রসারণের আশা নাই। শুষ্ক অঞ্চলে সেচের জন্য ‘প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা’ এই বৎসর অনুল্লিখিত রহিয়াছে, গত বৎসরের বরাদ্দ চার হাজার কোটি টাকার অর্ধেক খরচ হয় নাই। ‘প্রধানমন্ত্রী’ পদটি উল্লেখ করিয়া যে প্রকল্পগুলির বিশেষ গুরুত্ব বোঝানো হইয়াছিল, সেইগুলিও কার্যত উপেক্ষিত রহিয়া গেল। নূতন দিশা দেখাইতে সমগুরুত্বের কোনও প্রকল্প ঘোষিত হইল না, কেবল গঙ্গার ধারে জৈব চাষের স্বপ্ন বপন করা হইল।

ইহাতে উদ্বেগ জাগিতে বাধ্য। বহু বৎসর ধরিয়া ভারতের কৃষিক্ষেত্রটি অবহেলিত হইয়াছে, ফলে কৃষি ক্রমশ অলাভজনক হইয়াছে। পরিশ্রমী এবং কুশলী চাষিও চাষ ছাড়িতেছেন। মোড় ঘুরাইতে প্রয়োজন আইন ও বিধিতে সংস্কার, পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি, প্রভৃতি। তাহার সামান্যই হইয়াছে। পরিবেশ-বান্ধব, বিজ্ঞানসম্মত, উন্নত প্রযুক্তিচালিত কৃষির লক্ষ্যে কোনও নিবিড় পরিকল্পনা এখনও অবধি মেলে নাই। এই বৎসরও তাহার আশা স্তিমিত করিল কৃষি শিক্ষা ও গবেষণায় বরাদ্দে কার্পণ্য। কৃষকের প্রশিক্ষণ, কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রাণিবিজ্ঞান, মৎস্যবিজ্ঞানের গবেষণা হইতে রাজ্যগুলির কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনুদান, সকলই কমিয়াছে। অথচ, সকল উন্নত দেশ বিজ্ঞানের সহায়তাতেই কৃষির উন্নতি করিয়াছে। কৃষকের আয়বৃদ্ধি করিতে চাহিলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ প্রয়োজন। সরকার কেবলই দায় সারিতেছে। ফলে, কৃষকের আয়বৃদ্ধির আশা ক্রমেই সুদূরপরাহত হইতেছে।

সঙ্কটাপন্ন রোগীকে অক্সিজেন জুগাইবার মতো, কৃষিকে বাঁচাইবার শেষ উপায় সরকারি ক্রয়। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করিয়াছেন, এই বৎসর ২.৩৮ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে ন্যায্য মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয়ের জন্য। ইহা গত বৎসরের প্রকৃত খরচের তুলনায় কম। বিনামূল্যে শস্য বিতরণ ক্রমে কমাইবে কেন্দ্র, ইহা হয়তো তাহারই ইঙ্গিত। যদিও কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিল সরকারি ক্রয়ের নিশ্চয়তার দাবি। তবে কেবল খাদ্যশস্য নহে, বাজারে দাম পড়িলে দ্রুত ফসল কিনিবার প্রকল্পে (প্রাইস সাপোর্ট স্কিম) বরাদ্দও অনেকটা কমিয়াছে। অর্থাৎ কৃষিকে স্বনির্ভর করিবার দিশা নাই, কৃষকের সহায়তা পাইবার আশাও তেমন নাই। কৃষক ক্ষুব্ধ হইবেন, আশ্চর্য কী।

প্রকল্পের ফাঁদ

তবে সরকারের কর্তব্য নিরূপণে শীর্ষ আদালতের পরামর্শটি লইয়া চিন্তার প্রয়োজন রহিয়াছেভারতের সর্বংসহ গণদেবতাও যে দুই একটি বিষয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, অনাহার তাহার মধ্যে একটি। সম্ভবত বহু দুর্ভিক্ষের স্মৃতি প্রজন্ম হইতে প্রজন্মান্তরে বহন করিতেছে বলিয়াই অনাহারের সম্ভাবনা মানুষকে বিচলিত করে। শুধু নিজের অনাহার নহে— অন্যেরও। সামাজিক ক্ষেত্রে অতিবিরল সর্বজনীন সহমর্মিতার একটি নির্ভুল উদাহরণ এই ক্ষেত্রে বারংবার মিলে। সেই কারণেই কোনও সরকারই ক্ষুধা বা অনাহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করিতে চাহে না। শীর্ষ আদালত সম্প্রতি মনে করাইয়া দিল, রাজ্যগুলি অনাহারে মৃত্যুর পরিসংখ্যান প্রকাশ করে নাই বলিয়া মৃত্যুও ঘটে নাই, ইহা ধরিয়া লওয়া চলে না। বহু মানুষ ক্ষুধার্ত থাকিতেছেন, অনাহারে মৃত্যুও ঘটিতেছে। প্রধান বিচারপতি এন ভি রমণার বেঞ্চ অপুষ্টির সমস্যা হইতে পৃথক ভাবে গুরুত্ব দিয়াছে ক্ষুধাকে। ভারতে অপুষ্টি দীর্ঘ দিনের সমস্যা, খাদ্যাভাব তাহার একমাত্র কারণ নহে। খাদ্যাভ্যাস, শৌচাগার ব্যবহারের অভ্যাস, নানাবিধ অসুখ প্রভৃতি অনেক কারণের জন্য অপুষ্টি ঘটিয়া থাকে, তাই তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও নিবিড় ও দীর্ঘমেয়াদি হইবে, ইহাই প্রত্যাশিত। কিন্তু ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা আপৎকালীন ভিত্তিতে করা প্রয়োজন, সেখানে সরকারি কার্যসূচির পরিচিত গয়ংগচ্ছ ভাবটি চলিবে না। বিশেষত অতিমারি এবং তজ্জনিত আর্থিক সঙ্কট ক্ষুধার প্রকোপ বাড়াইয়াছে, এই কথা নানা বেসরকারি সমীক্ষা ও পর্যালোচনায় মিলিয়াছে, কিন্তু সরকার এ বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করে নাই। এই বক্তব্যের যথার্থতা সংশয়াতীত।

তবে সরকারের কর্তব্য নিরূপণে শীর্ষ আদালতের পরামর্শটি লইয়া চিন্তার প্রয়োজন রহিয়াছে। আদালত বলিয়াছে ক্ষুধা নিবারণে কোনও নূতন প্রকল্প শুরু করা প্রয়োজন, যেমন গণরসুই চালু করিয়া রান্না করা খাবার বিতরণ। কেন্দ্র এই মডেল তৈরি করিলে রাজ্যগুলি তাহার অনুসরণ করিবে, এমনই আশা প্রকাশ করিয়াছেন বিচারপতিরা। প্রশ্ন উঠিবে, অন্নের ব্যবস্থা করা অবশ্যই সরকারের কাজ, কিন্তু তাহার জন্য কি নূতন প্রকল্প প্রয়োজন? রান্না-করা খাবার সুলভে অথবা বিনামূল্যে দিবার প্রকল্প বহু রাজ্য নানা সময়ে মহা আড়ম্বরে চালু করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও গত বিধানসভা নির্বাচনে ‘মা’ ক্যান্টিন খুলিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, কিছু স্থানে শুরুও হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্য সে সব প্রকল্প নিয়মিত চালাইতে পারে নাই। পরীক্ষামূলক প্রকল্পের মডেল প্রয়োজন, কিন্তু গণরসুই বহু-পরীক্ষিত ধারণা। তাহার মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষমতা আছে, কিন্তু ক্ষুধার সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ তাহা নহে। শীর্ষ আদালত গণরসুইয়ের জন্য রাজ্যগুলিকে বাড়তি খাদ্যশস্য জুগাইবার পরামর্শ দিয়াছে। কিন্তু গণরসুইয়ের জ্বালানি, রন্ধন-উপকরণ, রন্ধনকর্মীর পারিশ্রমিক প্রভৃতির খরচ চাল-গমের খরচকে ছাড়াইয়া যায়। অতএব কেন্দ্র কেবল বাড়তি শস্য দিয়া দায় সারিলে তাহা রাজ্যগুলির প্রতি অন্যায় হইবে।

ক্ষুধার ভয়ঙ্কর ও অসহ সমস্যার সমাধান করা জরুরি। কিন্তু, তাহার জন্য নূতন প্রকল্পও প্রয়োজন নাই, দেখনদারিও নহে। মিড-ডে মিল অথবা অঙ্গনওয়াড়ির মতো প্রকল্প দীর্ঘ দিন চালু রহিয়াছে, কিন্তু বহু রাজ্য রান্না-করা খাবার বিতরণ স্থগিত রাখিয়াছে অতিমারিতে। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের মাসগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল, শিশু ও গর্ভবতীদের কিছুই মেলে নাই। গণবন্টন ব্যবস্থার যে নেটওয়ার্ক ভারতে রহিয়াছে, তাহারও যথাযথ ব্যবহার হয় না। পুরাতন প্রকল্পগুলির যথাযথ রূপায়ণ না করিয়া নূতন প্রকল্প চালু করিয়া কী লাভ হইবে? ক্ষুধার নিরসনে আপৎকালীন ভিত্তিতে কাজ প্রয়োজন, সুপ্রিম কোর্টের এই কথাটি শিরোধার্য। কিন্তু কী উপায়ে তাহা হইবে, সেই সিদ্ধান্ত প্রশাসনের উপরেই ছাড়িতে হইবে। **WBCS Bengali Compulsory Paper .com**

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

অর্থব্যবস্থার চাকা এক বার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে মুদ্রানীতির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কাজটি সহজতর হইবে।সাধারণ নাগরিকের তথাপি আশায় বুক না-বাঁধিয়া গতি নাই। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বাজেটের নিকট অনেকের অনেক রকম প্রত্যাশা থাকিবে। কিন্তু, এক শত চল্লিশ কোটির সিংহভাগ চাহিবে মাত্র দুইটি জিনিস: এক, যথেষ্ট কর্মসংস্থান; দুই, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। দুইটি চাহিদাই মানুষের অন্ন-বস্ত্রের প্রাথমিকতম প্রশ্নের সহিত অঙ্গাঙ্গি জড়িত। এবং, দুইটি সমস্যার সমাধান করা— বস্তুত, সমস্যা দুইটির যুগপৎ সমাধান করা— যে কতখানি কঠিন, অর্থমন্ত্রী বিলক্ষণ জানিবেন। অর্থশাস্ত্রের তত্ত্ব বলে, মূল্যস্ফীতির হার ও বেকারত্বের হার পরস্পরের সহিত ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কে বাঁধা। মূল্যস্ফীতির হার কমিলে বেকারত্বের হার বাড়িবে। কর্মসংস্থানের জন্য গতিশীল অর্থব্যবস্থা প্রয়োজন। অর্থব্যবস্থাকে গতিশীল করিতে হইলে শিথিল মনিটরি পলিসি বা মুদ্রানীতির পথে হাঁটাই বিধেয়। ভারতীয় রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক তাহাই করিতেছে— সুদের হার এখনও যথেষ্ট কম। কিন্তু, সুদের হার কম থাকিলে মূল্যস্ফীতির হার বাড়িবার সম্ভাবনা অধিক হয়। বাজেটে মুদ্রানীতির গতিপথ স্থির করিবার অবকাশ নাই, তাহা সত্য— কিন্তু, সরকারের সামগ্রিক আর্থিক নীতি যাহাতে শিথিল মুদ্রানীতির অপরিহার্যতাকে মাথায় রাখিয়াই রচিত হয়, তাহা নিশ্চিত করা জরুরি। বস্তুত, কর্মসংস্থান এবং মূল্যস্ফীতির মধ্যে যে কোনও একটি সমস্যার মোকাবিলা করিতে হইলে প্রথমটিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া বিধেয়। মূল্যস্ফীতি নিশ্চিত ভাবেই অর্থব্যবস্থার ক্ষতি করে, কিন্তু হাতে উপার্জন থাকিলে বর্ধিত মূল্যস্তরের সহিত লড়াই করিবার কাজটি সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজতর হয়। দ্বিতীয়ত, মূল্যস্ফীতির সমস্যাটি অন্তত আংশিক ভাবে হইলেও এমন কিছু বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যাহা প্রত্যক্ষ ভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে। যেমন, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম। সুতরাং, যাহা আয়ত্তাধীন, প্রথমে সেই কাজে মন দেওয়াই বিধেয়।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যটি সরাসরি অর্থব্যবস্থার স্বাস্থ্যের সহিত জড়িত। বাজার চাঙ্গা হইলে তবেই উৎপাদন বাড়িবে, কর্মসংস্থান হইবে। আবার, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না থাকিলে বাজারে চাহিদা বাড়িবে কোন পথে? এখানেই সরকারের ভূমিকা। লাগামছাড়া রাজকোষ ঘাটতি সাধারণত দুশ্চিন্তার বিষয়, কিন্তু পরিস্থিতিভেদে তাহা বিশল্যকরণীর কাজ করিতে পারে। আপাতত ঘাটতির কথা না ভাবিয়াই সরকারকে ব্যয় করিতে হইবে— এমন ক্ষেত্রে, যাহাতে কর্মসংস্থান ঘটে। জাতীয় কর্মসংস্থান যোজনার ন্যায় প্রকল্পে ব্যয় করা জরুরি, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। এমন ক্ষেত্রে ব্যয় করা প্রয়োজন, যাহা একই সঙ্গে বর্তমানে কর্মসংস্থান করিবে, এবং ভবিষ্যতের আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করিবে। পরিকাঠামো তেমনই একটি ক্ষেত্র। এই বাজেটে অর্থমন্ত্রী পরিকাঠামো নির্মাণের খাতে কতখানি বরাদ্দ করেন, তাহা আর্থিক বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধানের গতিপথ নির্দিষ্ট করিয়া দিবে। এক দিকে যেমন বাহ্যিক পরিকাঠামো প্রয়োজন— বিদ্যুৎ, সড়ক, বন্দর, বিমানবন্দর ইত্যাদি— অন্য দিকে তেমনই সামাজিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন। বিশেষত স্বাস্থ্যখাতে পরিকাঠামোয় বর্ধিত লগ্নি বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, সময়ের উভয় পরিসরের পক্ষেই অতি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থব্যবস্থার চাকা এক বার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে মুদ্রানীতির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কাজটি সহজতর হইবে।

WBCS Bengali Compulsory Paper .com

সবুজের মর্যাদা

সাম্প্রতিক অতীতেও একাধিক বার ময়দানের পরিবেশ লইয়া নির্দেশ দিয়াছিল কলিকাতা হাই কোর্ট।কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে”— কবিতায় লিখিয়াছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবির শব্দগুলি উঠিয়া আসিয়াছিল কলিকাতা মহানগরীর প্রতি কবির গভীর মোহঘোর হইতে। আজ কিন্তু মহানগরের বাসিন্দারা অন্য ভাবে তাঁহার শব্দগুলিকে ফিরিয়া অনুভব করিতে পারেন। বিষম দূষণে আজ কলিকাতা ফুসফুসরূপী বিশালাকার প্রান্তর ময়দান ভারাক্রান্ত হইতে বসিয়াছে। ফুসফুসই যদি এই ভাবে বিষাইয়া যায়, তবে বাকি শহরের পাথর হইতে আর বাকি কী থাকে! বিষক্রিয়ার মাত্রা বুঝিতে পরিবেশবিজ্ঞানীদের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন নাই। খালি চোখেই দেখা যায়, কী ভাবে যত্রতত্র জঞ্জালের স্তূপ জমিয়াছে, প্লাস্টিক হইতে জৈব জঞ্জাল সবই জমিয়া অনন্ত অপেক্ষায় রহিয়াছে— কখন কোন শুভক্ষণে প্রশাসনিক দৃষ্টিপাত হইবে, তাহার জন্য! শীতকালে এই স্তূপ কেন অতি দ্রুত বাড়িতে থাকে, বুঝিতে অসুবিধা নাই। এমনকি করোনাকালেও ময়দান প্রান্তরে মানুষের আনাগোনার অবধি নাই। আর, আনাগোনা হইবে না-ই বা কেন, শহরের কেন্দ্রস্থলে এমন একটি সবুজ ময়দান থাকিলে সেখানে তো শীতবিকালের ভ্রমণ সঙ্গত নাগরিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। অথচ মুশকিল ইহাই— নাগরিক অধিকারের সহিত অঙ্গাঙ্গি মিশিয়া থাকে দূষণের অধিকারও। তাই স্বল্প সময়ের জন্য আসিয়াও মানুষ যৎপরোনাস্তি জঞ্জাল ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারেন। অবশ্যই, তাহার সহিত যুক্ত হয় সাগরমেলাযাত্রীদের শিবির এবং তজ্জনিত দূষণ। কলিকাতার দুর্ভাগ্য, প্রশাসন ও নাগরিক দুই পক্ষই এই বিষয়ে একই রকম নির্বিকার। নাগরিকের কিছুমাত্র বিবেকদংশন হয় না এই ভাবে নিজের শহরকে নোংরা করিতে। এবং প্রশাসনের কিছুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে না, শহরের মুক্তাঙ্গনটিকে এই ভাবে দূষিত ও বিষায়িত করিয়া ফেলিয়া রাখিতে। প্রশাসনকে তাহার কাজ ঠিক ভাবে করাইবার জন্য নাগরিক মহল হইতে কোনও চাপ নাই। নাগরিককে তাহার দায়িত্ব ঠিক ভাবে মানাইবার জন্য প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ নাই।

উদ্যোগ আছে, কিংবা ছিল, কেবল আদালতের। অতীতে, এমনকি সাম্প্রতিক অতীতেও একাধিক বার ময়দানের পরিবেশ লইয়া নির্দেশ দিয়াছিল কলিকাতা হাই কোর্ট। এই সব নির্দেশে প্রাথমিক ভাবে কিছু কর্তাদের মধ্যে নাড়াচাড়া পড়ে, তাহার পর সমস্ত সচেতনতার সমাধি ঘটে। অবশ্য ভাবিতে হইবে, মাথাব্যথা কেবল বিচারবিভাগের কেন। ময়দান পরিষ্কার রাখা না-রাখার বিষয়ে কেন আদালতকেই হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। বিশ্বের বহু বড় শহরের কেন্দ্রভূমিতে এমন নগরহৃদয়-রূপী পার্ক রহিয়াছে, সেগুলি দেখিলে আন্দাজ পাওয়া যায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি কী ভাবে সেই সব শহর-প্রশাসন করিয়া থাকে। এবং কী ভাবে নাগরিক শহরের মান্য বিধি মানিয়া থাকে। ইহা তো কেবল একটি ময়দানের প্রশ্ন নহে। শহরের যে কোনও সবুজ মাঠই যে জঞ্জাল ফেলিবার অত্যুপযোগী পরিসর নহে, প্রশাসনকে তাহা বুঝিতে ও মানিতে হইবে। পুরাতন কলিকাতার বিবিধ মাঠ হইতে সল্টলেক-নিউ টাউনের মাঠ, সবই বলিয়া দেয়— সবুজের পরিচ্ছন্নতার মর্যাদা এই শহরে ক্ষীণ। অথচ সবুজ রক্ষার কাজটি কিন্তু প্রশাসনের দাক্ষিণ্য বিতরণ নহে। তাহা নাগরিকের একান্ত অধিকার। নাগরিক বাসস্থানকে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর রূপে পাইবার অধিকার।

WBCS Bengali Compulsory Paper .com

নাগরিকত্বের পাঠ

শাসকরা নাগরিকদের শাসন করিবেন বটে, কিন্তু সেই শাসন স্বেচ্ছাচার নহে— নাগরিকদের সম্মতিক্রমে রচিত সূত্র অনুসারেই সেই শাসন পরিচালিত হইবে।বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কি সংবিধানকে অন্তর্ভুক্ত করা বিধেয়? প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে প্রশ্নটি উঠিয়াছে। প্রশ্নটির এক কথায় উত্তর সম্ভব— হ্যাঁ। স্কুলশিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় ভবিষ্যতের নাগরিককে তাহাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের অর্থ অনুধাবন করিতে সাহায্য করা, তবে ত্রিকোণমিতির সূত্র অথবা তুন্দ্রা অঞ্চলের জলবায়ুর তুলনায় সংবিধান সম্বন্ধে সচেতনতার গুরুত্ব প্রশ্নাতীত রকম বেশি। তাহার প্রত্যক্ষ কারণ হইল, স্বাধীন রাষ্ট্রে নাগরিকের কোন অধিকার স্বীকৃত, সেই বিষয়ে সংবিধান প্রবর্তনের সাত দশক পরেও দেশের অধিকাংশ মানুষ নিতান্ত অজ্ঞ। এই অজ্ঞানতা শাসকদের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধাজনক— কারণ, অধিকার সংক্রান্ত জ্ঞানই ‘প্রজা’কে ‘নাগরিক’ করিয়া তুলিতে পারে। শাসক যখন নাগরিকের অধিকার খর্ব করে, তখন নাগরিকের পক্ষে যদি সেই অন্যায়ের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা সম্ভব হয়, তখন শাসকের কাজটি কঠিনতর হয়। যে নাগরিক প্রত্যক্ষ ভাবে সেই অন্যায়ের শিকার নহেন, তাঁহার চোখেও শাসকের অন্যায্যতা প্রকট হইলে নাগরিকের সহজাত নৈতিকতার বোধ সরকারের বৈধতাকে প্রশ্ন করিতে পারে। নাগরিকের নিকট বৈধতা হারাইবার ভয়েই বহু ক্ষেত্রে শাসকরা সংযত হইবেন, এমন আশা নিতান্ত অলীক নহে।

কিন্তু, এই প্রত্যক্ষ কারণই একমাত্র নহে। সংবিধান বস্তুটিকে একটি চুক্তিপত্র হিসাবে দেখা সম্ভব— রাষ্ট্র এবং নাগরিকের মধ্যে রচিত চুক্তি। শাসকরা নাগরিকদের শাসন করিবেন বটে, কিন্তু সেই শাসন স্বেচ্ছাচার নহে— নাগরিকদের সম্মতিক্রমে রচিত সূত্র অনুসারেই সেই শাসন পরিচালিত হইবে। ভারতীয় সংবিধানের উপক্রমণিকায় জানানো হইয়াছিল, “উই, দ্য পিপ্‌ল অব ইন্ডিয়া”— আমরা ভারতীয় নাগরিকেরা— নিজেদের এই সংবিধান প্রদান করিতেছি। উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া নহে, এই সংবিধান ভারতের নাগরিকরা নিজেদের জন্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহাকে আলঙ্কারিক অতিকথন বলিয়া উড়াইয়া দিলে সংবিধানের মূলমন্ত্রটিকেই অস্বীকার করা হয়। এই রচনার প্রক্রিয়াটি এককালীন নহে। সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব, এবং সেই কাজটি হইয়া থাকে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকের চুক্তিপত্র রচনার কাজটি চলিতেছে। সেই প্রক্রিয়ায় শুধু উচ্চশিক্ষিত, উচ্চকোটির নাগরিকরাই অংশগ্রহণ করিলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিবে— একশত চল্লিশ কোটি নাগরিকের প্রত্যেকের অধিকার স্ব-শাসনের চুক্তিপত্র রচনার প্রক্রিয়ায় যোগ দেওয়ার।

গণতন্ত্র কথাটি তাহার প্রকৃত অর্থে উপনীত হয় তখনই, যখন আলোচনার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়। শুধু সংসদ ভবনের অভ্যন্তরে আলোচনা নহে; শুধু পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায়, অথবা বিদ্বৎসমাজের সভাগৃহে আলোচনা নহে— সমাজের সর্বস্তরে সেই আলোচনা চলা বিধেয়। তাহার ভিত্তি হইতে পারে সংবিধান সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা। স্বাধীন রাষ্ট্রে নাগরিকের যে অধিকার স্বীকৃত, তাহা ব্যবহারিক ভাবে পাওয়া যাইতেছে কি না; অথবা, এখনও যে অধিকারের স্বীকৃতি নাই, তাহা আদায় করা আদৌ প্রয়োজন কি না— নাগরিকের জীবনে এই প্রশ্নগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। এই গুরুত্বের কথা নাগরিককে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে সংবিধান সম্বন্ধে সচেতনতা। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে সংবিধানের অন্তর্ভুক্তিই তাহার প্রথম ধাপ হইতে পারে।

WBCS Bengali Compulsory Paper .com

বিলম্বের মূল্য

নিয়মিত অডিট ও তাহার ফল জনসমক্ষে প্রকাশ করিলে অর্থ বাঁচিবে, গণতন্ত্রও।সময়ের দাম কত, তাহার একটি হিসাব মিলিয়াছে। ভারতে পরিকাঠামো নির্মাণের ৫৪১টি বৃহৎ প্রকল্প যথাসময়ে শেষ হয় নাই, আরও কিছু প্রকল্প রূপায়ণ কালেই খরচ বাড়িয়াছে। সব মিলাইয়া অন্তত চার লক্ষ কোটি টাকা বাড়তি খরচ হইতেছে। তাহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ আঠারো হাজার কোটি টাকা। রাজ্যে সাতাশটি প্রকল্প সময়সীমা পার করিয়াও সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। বর্ধিত ব্যয়ের সম্পূর্ণ হিসাব অবশ্য ইহা নহে; নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া কেবল দেড়শত কোটি টাকার অধিক মূল্যের প্রকল্পগুলির হিসাবই প্রকাশ করিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর। এই উদ্বেগ যুক্তিযুক্ত— ভারতের নানা প্রান্তে পরিকাঠামো অনুন্নত দেশগুলির সমান। তদুপরি সরকারের অর্থভান্ডারে বড়ই টানাটানি। অর্ধ-সম্পূর্ণ, সিকি-সম্পূর্ণ যে সকল নির্মাণ জলে-রোদে এবং চৌর্যবৃত্তিতে নষ্ট হইতেছে, তাহার পুনর্নির্মাণের ব্যয় রাজকোষের সঙ্কট বাড়াইবে। তবে নাগরিকের দৃষ্টিতে হিসাব করিলে সরকারি ক্ষতির হিসাবও সামান্য মনে হইতে পারে। রাস্তা, সেতু, পরিবহণ, হাসপাতাল প্রভৃতির নির্মাণ অসমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত থাকিবার জন্য কত মানুষের জীবন-জীবিকায় কত ক্ষতি হইয়াছে, কে তাহা নির্ধারণ করিতে পারে? এক একটি প্রজন্ম যথাযোগ্য রোজগারের সম্ভাবনা হারাইয়াছে, দেশ মানবোন্নয়নের সূচকে পিছাইয়াছে, আর্থিক বৃদ্ধির গতি মন্দ হইয়াছে। সরকারি প্রকল্পে অসম্পূর্ণতার ক্ষত অগণিত মানুষ প্রতি দিন বহন করিতেছেন। কেবল টাকা দিয়া তাহার হিসাব হয় না।

তবে টাকার হিসাবের প্রয়োজনও কম নহে। যেটুকু বলিলে রাজনৈতিক অসুবিধা নাই, কেবল ততটুকু প্রকাশ করিতেছে কেন্দ্র ও রাজ্য। কিন্তু রাজকোষের অর্থব্যয়ের বিশদ হিসাব জানিবার অধিকার নাগরিকের রহিয়াছে। যেমন, অনূর্ধ্ব দেড়শত কোটি টাকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সংখ্যাই অধিক, সেইগুলিতে কত বিলম্ব হইতেছে তাহার তথ্য হিসাব কোথায়? কেবল রাজ্য সরকারের অর্থে নির্মীয়মাণ প্রকল্পে কত বিলম্ব হইতেছে? রাজ্যের অধিকাংশ দফতর বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ বন্ধ করিয়াছে; রাজ্য বাজেট ও তৎপূর্ববর্তী আর্থিক সমীক্ষা সারবত্তা হারাইয়াছে; চতুর্থ অর্থ কমিশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পাঁচ বৎসর পরেও নূতন কমিশন গঠিত হয় নাই, তাই রাজ্যের আয়-ব্যয়ের স্বাধীন বিশ্লেষণও নাই। সিএজি-র রিপোর্টে খণ্ডচিত্র মেলে শুধু। ফলে সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি, তথা সাফল্য-ব্যর্থতা সম্পর্কিত তথ্যের একমাত্র সূত্র হইয়া উঠিতেছে নির্বাচনী প্রচার। এই কারণেই রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্প প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত, আর কেন্দ্র কেবল বিরোধী রাজ্যগুলির ব্যর্থতার উপর আলো ফেলিতে আগ্রহী।

কেন্দ্র ও রাজ্যে শাসক দল ক্ষমতার দ্বন্দ্বে উন্নয়নকে পণবন্দি করিয়াছে। মেট্রো রেল নির্মাণ বা জাতীয় সড়ক সংস্কারের প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্যের সহযোগিতার চাইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই চোখে পড়ে অধিক। অথচ, পরিকাঠামো নির্মাণে গতি আনিতে হইলে আইন, বিধি, রীতি-নীতিতে সংস্কার প্রয়োজন, কেন্দ্র ও রাজ্যের সুসম্পর্ক ভিন্ন যাহা সম্ভব নহে। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং পরিবেশের ছাড়পত্র প্রাপ্তি, দরপত্র আহ্বান, বরাত দানে স্বচ্ছতা ও গতি, এই সকলের জন্য উভয় পক্ষের সংহতি আবশ্যক। তৎসহ নিয়মিত অডিট ও তাহার ফল জনসমক্ষে প্রকাশ করিলে অর্থ বাঁচিবে, গণতন্ত্রও।

WBCS Bengali Compulsory Paper .com

মূল সমস্যা

রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি-র প্রথম পত্রটির সূচনায় সমাজের সুযোগবঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবীর দুর্দশা সম্পর্কে একটি অসামান্য বাক্য আছে: "তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে— উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।" সঙ্গত কারণেই উক্তিটি সুবিদিত এবং বহুচর্চিত। উপরের আলো এবং নীচের অন্ধকার, তথা ন্যূনাংশিকের সমৃদ্ধি এবং বৃহদাংশিকের দারিদ্রের এই সহাবস্থানে যে বিপুল আর্থিক বৈষম্য, রবীন্দ্রনাথকে তাহা নিরন্তর তীব্র পীড়া দিত। তাঁহার বহু রচনায় এবং ভাষণে তাহার গভীর পরিচয় আছে। তাহার জন্য তাঁহাকে 'সাম্যবাদী' মতাদর্শের ধ্বজা ধরিতে হয় নাই, সম্পদ পুনর্বণ্টনের জবরদস্তিকে তিনি অনুমোদন করেন নাই, স্তালিন-শাসিত রাশিয়ায় আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাসের প্রশংসা করিবার সঙ্গে সঙ্গে 'জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব' এবং তাহার অশুভ পরিণামের বিষয়ে অন্তর্ভেদী সমালোচনায় তিনি স্পষ্টবাক। কিন্তু অস্বাভাবিক বৈষম্যের অন্তর্নিহিত অন্যায়কে স্পষ্ট ভাষায় চিহ্নিত করিতেও তাঁহার ভুল হয় নাই।

কোভিড অতিমারির কালে বৈষম্য যে চরম মাত্রায় পৌঁছাইয়াছে, তাহার রূপ দেখিলে রবীন্দ্রনাথের লেখনীও হয়তো নির্বাক হইয়া যাইত। গত এক বৎসর বা তাহার কিছু অধিক সময় ধরিয়া বৈষম্য বৃদ্ধির নানাবিধ পরিসংখ্যান প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি সেই ধারায় নূতন বিভীষিকা সংযোজন করিল অক্সফ্যাম নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নূতন সমীক্ষার রিপোর্ট। এই রিপোর্ট দেখাইতেছে যে, বিশ্ব জুড়িয়া আর্থিক বৈষম্যের মাত্রা বিপুল ভাবে বাড়িয়াছে, বাড়িয়াছে ভারতেও। মনে রাখা দরকার, সাম্প্রতিক কালে আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে ভারতে বৈষম্যের মাত্রা রীতিমতো চড়া। তাহার উপর, অতিমারির অভিঘাতে দেশের অধিকাংশ নাগরিকের আয় এবং জীবনমানে যখন বড় রকমের অবনতি ঘটিয়াছে, সেই সময়পর্বেই স্ফীত হইয়াছে উপরতলার ঐশ্বর্যবানদের সম্পদ। অর্থাৎ পূর্বাবস্থাতেই বৈষম্য বিপুল ছিল, সঙ্কটকালে তাহা বিপুলতর— সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র দরিদ্রতর হইতেছেন, অনুপাতে নিতান্ত সংখ্যালঘু সম্পন্নরা সম্পন্নতর।

পূর্বাবস্থার কারণেই এই পরিণাম গভীর উদ্বেগের কারণ। দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আর্থিক অবস্থা যদি চলনসই হয়, তাহা হইলে উপরতলার বাড়তি সমৃদ্ধি তথা বৈষম্য লইয়া অতিরিক্ত চিন্তিত হইবার কারণ থাকে না, বরং কিছু দূর অবধি অসাম্য আর্থিক উৎসাহ ও উন্নতির অনুকূল হয়— পরিপূর্ণ সাম্য ভূভারতে কোথাও উন্নয়নের সহায়ক হয় নাই। কিন্তু ভারতের সমস্যা ইহাই যে, দেশের এক বিপুলসংখ্যক নাগরিক এখনও হতদরিদ্র। এই পরিস্থিতিতে যখন বৈষম্য বাড়ে, তখন অর্থনীতি ও সমাজের কাঠামোয় বড় রকমের অসঙ্গতি তৈয়ারি হয়। সেই অসঙ্গতি আয়বৃদ্ধিরও প্রতিকূল। ধনীদের আয়ের অনুপাতে ভোগব্যয়ের মাত্রা দরিদ্র বা মধ্যবিত্তের তুলনায় অনেক কম, বিশেষত সাধারণ ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্পন্নদের চাহিদা হইতে বহুলাংশে বঞ্চিত। তাহার ফলে, আয় ও সম্পদের বৈষম্য প্রথমত বাজারের চাহিদায় মন্দা ডাকিয়া আনে, দ্বিতীয়ত চাহিদার ভারসাম্য নষ্ট করে। চাহিদা-মন্দার কারণে নূতন বিনিয়োগও ব্যাহত হয়। ভারতে তাহাই ঘটিতেছে— এক দিকে পণ্যের বাজারে মন্দা; অন্য দিকে প্রভূত বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বিনিয়োগে ভাটার টান। বৈষম্যের সমস্যাটিকে সচরাচর ন্যায় বা নৈতিকতার দৃষ্টিতে বিচার করা হয়, 'বৈষম্য-অলক্ষ্মী' বা 'লক্ষ্মী বনাম কুবের' ইত্যাদি উপমা টানিয়া পবিত্র সাম্যবাদী ক্রোধ প্রকাশে বামপন্থী আলোচকদের বিপুল উৎসাহ। কিন্তু দারিদ্রের মধ্যে বিপুল বৈষম্যের সমস্যাটিকে এই ব্যবহারিক দিক হইতে বিচার করা জরুরি। প্রদীপের আলোয় আপত্তির কারণ নাই, পিলসুজের দুর্গতি দূর করা দরকার। **WBCS Bengali Compulsory Paper .com**

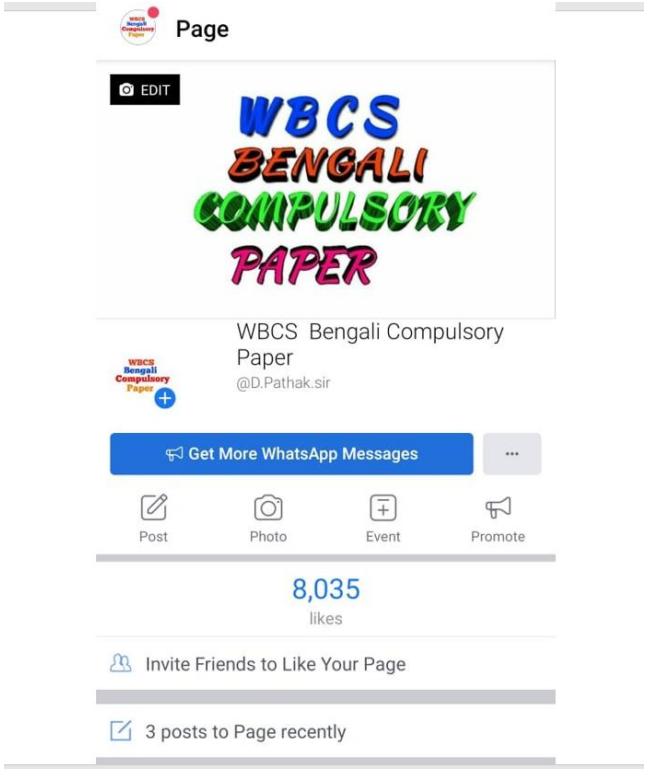

WBCS Bengali Compulsory paper

- **Online class -₹200 /month**
- WhatsApp : 7047352328

Google meet on Saturday & Sunday at 8am .Bengali Compulsory Notes , Practice paper , full mock. Bengali Compulsory

- **সপ্তাহে দুই দিন Practice set**
- ***লিখে পাঠাতে হবে সেই দিন রাত ১২টার মধ্যে /print*** *করে খাতা দেখা হবে / খাতা দেখার পর মোডেল উত্তরপত্র দেওয়া হবে /লেখাগুলো* ***7047352328*** *নাম্বারে পাঠাতে হবে*